Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 73-82
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.119

বাংলা ভাষায় মগধী প্রাকৃতের প্রভাব: একটি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

অনম্যা রায়, *গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 20.07.2026; Accepted: 26.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Bengali language, an Eastern Indo-Aryan tongue, traces its genealogical ancestry back to the Old Indo-Aryan Sanskrit through intermediate Middle Indo-Aryan stages. Among these, Magadhi Prakrit—and its derivative Magadhi Apabhramsha—served as the primary linguistic substrate that shaped the phonological, morphological, and syntactic foundations of Proto-Bengali. This research article examines the historical and structural impact of Magadhi Prakrit on the evolution of modern Bengali.

Through a comparative diachronic analysis, this paper investigates key phonological shifts, such as the sibilant merger (where Sanskrit's three sibilants /s/, /ṣ/, /ś/ collapsed into a predominant palatal /ś/ in Magadhi and Bengali) and the retention of unvoiced stops. Morphologically, the study explores how Magadhi Apabhramsha's inflectional simplification facilitated Bengali's transition toward an analytic structure, influencing its case-endings, verbal conjugations, and pronominal systems. Additionally, the paper analyzes lexical inheritances (tadbhava words) that survived through the Magadhi lineage to form the core vocabulary of daily Bengali communication.

By synthesizing historical linguistics, epigraphic evidence, and comparative grammar, this article demonstrates that Magadhi Prakrit provided the foundational blueprint for Bengali's unique identity within the Eastern Indo-Aryan language family. The findings offer clearer insights into the dialectal continuum of Eastern India and underscore the enduring heritage of Middle Indo-Aryan vernaculars in contemporary regional languages.

Keywords: Magadhi Prakrit, Bengali Linguistics, Eastern Indo-Aryan, Phonological Shift, Tadbhava Lexicon

বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বিকাশ ও বিবর্তনের পথ পরিক্রমায় মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যযুগীয় রূপ তথা প্রাকৃত ভাষা থেকেই আধুনিক বাংলাভাষার জন্ম। প্রাচ্য প্রাকৃতের অন্যতম শাখা মাগধী প্রাকৃত এবং তার পরবর্তী রূপ মাগধী অপভ্রংশ থেকেই প্রধানত বাংলা, অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় (প্রাকৃত) রূপ নেয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, পূর্ব ভারতের প্রচলিত 'মাগধী প্রাকৃত' থেকেই 'মাগধী অপভ্রংশ' -এর মাধ্যমে বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ ঘটে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে-

"মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে এবং এই মাগধী প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ মাগধী অপভ্রংশের মধ্য দিয়েই বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার বিকাশ ঘটেছে।"[১]

প্রাকৃত কেবল ভৌগোলিক সীমান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পূর্বাঞ্চলীয় সমস্ত ভাষার মৌলিক ব্যাকরণগত ও ধ্বনিগত অবকাঠামো তৈরি করেছিল। বাংলা ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনিকাঠামোর অনেক মৌলিক বৈশিষ্ট্য সরাসরি মাগধী প্রাকৃত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত:

'শ' (ʃ) ধ্বনির প্রাধান্য: মাগধী প্রাকৃতে তিনটি 'স' ধ্বনি (শ, ষ, স)-এরমধ্যে তালব্য 'শ' ধ্বনির প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। আধুনিক বাংলাতেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'স' ও 'ষ' ধ্বনি 'শ' হিসেবে উচ্চারিত হয় (যেমন: 'সত্য' -> 'শত্য')।

'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে মাগধী প্রাকৃতের প্রধান ধ্বনি বৈশিষ্ট্য তিনটি—

(১) তিন 'শ' -ধ্বনিতেই শ-কারের উচ্চারণ (অর্থাৎ শ, ষ, স > শ)

(২) 'র' ধ্বনির স্থানে 'ল' ধ্বনি (অর্থাৎ র > ল)

(৩) অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে বিভক্তি 'এ' (অর্থাৎ ঃ > -এ)।[২]

'র' ও 'ল' ধ্বনির রূপান্তর: প্রাচীন মাগধী প্রাকৃতে অনেক সময় 'র' ধ্বনি 'ল'-তে রূপান্তরিত হতো। বাংলায় বহু তদ্ভব শব্দে এই প্রবণতার ছাপ দেখা যায়। বাংলা ভাষার কারক, বিভক্তি ও ক্রিয়াপদের গঠনেও মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারক বিভক্তির বিকাশ: প্রাকৃতের 'এ' বিভক্তি (যেমন- প্রথমা ও সপ্তমী বিভক্তিতে 'এ') আধুনিক বাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় (যেমন: 'মানুষে বলে', 'ঘরে আছে')। ক্রিয়াপদের রূপান্তর: মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের কৃদন্ত রূপ থেকেই বাংলা অতীয় ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ (যেমন: 'করিল', 'করিব') তৈরি হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মাগধী প্রাকৃত সংক্রান্ত মত সংশোধন করে জানান যে, "বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত নয়, বরং গৌড়ী প্রাকৃত (পরবর্তীতে গৌড়ী অপভ্রংশ) থেকে এসেছে।"

মাগধী প্রাকৃত ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি প্রসঙ্গে তাঁর বই থেকে সরাসরি কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচে তুলে ধরা হলো:

> "আমাদের মতে প্রাচীন গৌড় দেশে যে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তাহার নাম গৌড়ী প্রাকৃত। ... এই গৌড়ী প্রাকৃত হইতেই গৌড়ী অপভ্রংশ এবং গৌড়ী অপভ্রংশ হইতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।"[৩]
>
> "ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সেন বাংলা ভাষার উৎপত্তি মাগধী প্রাকৃত হইতে অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় যে প্রাকৃতে আধুনিক বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার বীজ নিহিত ছিল, তাহা মাগধী প্রাকৃতের চেয়ে গৌড়ী প্রাকৃতের সহিতই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।"[৪]

মাগধী প্রাকৃত সরাসরি একদিনে আধুনিক বাংলায় রূপ নেয়নি। সময়ানুক্রমিক বিবর্তনের ধারাটি মূলত তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত.মাগধী প্রাকৃতের শেষ স্তর অর্থাৎ মাগধী অপভ্রংশ বা অবহট্ঠরূপ থেকেই খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতকের দিকে প্রাচীন বাংলা ভাষার (চর্যাপদের ভাষা) অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। ড. রামেশ্বর শ' তাঁর বিখ্যাত 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তন এবং প্রাকৃত শাখা হিসেবে মাগধী প্রাকৃতের অবস্থান আলোচনা করেছেন। মাগধী প্রাকৃত এবং তা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি প্রসঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্য সরাসরি নিচে উল্লেখ করা হলো:

> "পূর্ব ভারতের প্রাকৃত অর্থাৎ 'মাগধী প্রাকৃত' থেকেই প্রাচীন বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার জন্ম— এই ধারণাই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সর্বজনগ্রাহ্য।"

মাগধী প্রাকৃতের তিনটি প্রধান ধ্বনিগত চিহ্ন দেখা যায়—

১. অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে 'এ' বিভক্তি প্রাপ্তি (যেমন: নরঃ > নলে)।

২. 'র' ধ্বনির স্থানে 'ল' ধ্বনি উচ্চারণ (যেমন: রাজা > লাজা)।

৩. তিনটি উষ্মধ্বনি (শ, ষ, স)-র বদলে কেবল 'শ' (ś)-এর ব্যবহার (যেমন: দাসঃ > দাশে)।

বাংলা ভাষায় এই মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশের ধারাটিই মূলত রক্ষিত হয়েছে, যদিও পরবর্তীকালে বাংলা স্বকীয় ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।[৫]

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস ভারতীয় আর্যভাষার এক দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় যাত্রাপথ। বৈদিক ভাষা থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়া নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রধানত দুটি ভিন্ন ধারার মতামত দেখা যায়, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মাগধী প্রাকৃত।আধুনিক বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন যে, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (MIA) পূর্বাঞ্চলীয় রূপ মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

ভাষা বিবর্তনের ধারা: এঁদের মতে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বিবর্তিত হয়ে মাগধী প্রাকৃতে রূপ নেয়। পরবর্তীতে মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ (বা অবহট্‌ঠ) এবং তা থেকে আনুমানিক খ্রিস্টিয় দশম শতকের দিকে বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া—এই তিনটি নিকটবর্তী ভাষার জন্ম হয়।ধ্বনিগত প্রমাণের ভিত্তি:মাগধী প্রাকৃতের তিনটি প্রধান ধ্বনিগত লক্ষণ আধুনিক বাংলা ভাষায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়:

শ'-ধ্বনির প্রাধান্য: সংস্কৃতের s, \ṣ, ś—এই তিনটি উষ্মধ্বনির উচ্চারণ মাগধীতে 'শ' (ś)-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, যা আধুনিক বাংলায় প্রবলভাবে বিদ্যমান।

র' > 'ল' প্রবণতা: মাগধী প্রাকৃতে 'র' ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে 'ল'-তে পরিণত হতো (যেমন: রাজা > লাজা)। বাংলায় এর বহু ঐতিহাসিক প্রভাব দেখা যায়।বিভক্তি রূপ: প্রথমার একবচনে 'এ' বিভক্তির প্রাধান্য (যেমন: নরঃ > নলে)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মাগধী প্রাকৃতকে বাংলার সরাসরি জননী হিসেবে গ্রহণ করতে চাননি। তিনি একটি ভিন্ন ও স্বাধীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন: গৌড়ী প্রাকৃতের প্রাধান্য:

তাঁর মতে, প্রাচীন বাংলা ও তৎকালীন গৌড় অঞ্চলের (বর্তমান বঙ্গদেশ) কথ্য ভাষা মাগধের (বিহার অঞ্চল) নিজস্ব প্রাকৃত থেকে কিছুটা আলাদা ছিল। তাই তিনি একে গৌড়ী প্রাকৃত বলে চিহ্নিত করেন।

বিবর্তনের সময়কাল: তাঁর প্রস্তাবিত ধারা অনুযায়ী, গৌড়ী প্রাকৃত\rightarrow গৌড়ী অপভ্রংশ \rightarrow প্রাচীন বাংলা। তিনি বাংলা ভাষার সূচনা কালকে সুনীতিকুমার অপেক্ষা কিছুটা এগিয়ে (খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক) নিয়ে যান। সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় মতবাদের মূল লক্ষ্য প্রাচীন বঙ্গভূমির কথ্য আর্যভাষার শেকড় চিহ্নিত করা। যদিও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'গৌড়ী প্রাকৃত' মতবাদটি অঞ্চলের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের (গৌড়) দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ, তথাপি ধ্বনিবিজ্ঞান ও রূপতাত্ত্বিক প্রমাণের বিচারে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রামেশ্বর শ'-এর 'মাগধী প্রাকৃত' কেন্দ্রিক সিদ্ধান্তটিই ভাষাবিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত। বলা যায়, পূর্বাঞ্চলীয় মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের অববাহিকাতেই বাংলা ভাষার আদি প্রাণস্পন্দন তৈরি হয়েছিল।

বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষার (Dialects) ওপর মাগধী প্রাকৃতেরপ্রভাব সমভাবে দেখা যায় না। ভৌগোলিক সান্নিধ্যের কারণে রাঢ়ী এবং পূর্বী (বঙ্গালী) উপভাষায় মাগধী প্রাকৃতের লক্ষণসমূহ সবচেয়ে সুস্পষ্ট আকারান্ত পদ গঠন: মাগধী প্রাকৃতে শব্দের শেষে 'আ' যুক্তকরার একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। বঙ্গালী বা পূর্বী উপভাষায় আজওএই রূপান্তর অত্যন্ত স্পষ্ট (যেমন: 'ছেলে' 'চেলা', 'ব্যাটা' 'বেডা')। সমাসবদ্ধ পদের

সরলীকরণ: প্রাকৃতের জটিল সমাসবদ্ধ পদ ভেঙে বাংলায় নতুন অনুসর্গ বা অনুসর্গবাচক শব্দের জন্ম হয়েছে (যেমন: 'দ্বারা', 'দিয়া', 'হতে')।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'The Origin and Development of the Bengali Language' (ODBL) (১৯২৬)-এ মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত অপভ্রংশের শাখাগুলোর ভৌগোলিক বিস্তারের ওপর ভিত্তি করে বাংলা উপভাষাগুলোর শ্রেণীবিভাগ ও মাগধী ভাষার প্রভাব আলোচনা করেছেন। বাংলা উপভাষার ওপর মাগধী প্রাকৃতের বিভাজন ও প্রভাব সম্পর্কে তাঁর বইয়ের সরাসরি অংশ (Direct Quote) নিচে উল্লেখ করা হলো:

"Eastern Magadhi Prakrit and Apabhramsa has four dialect groups—
(1) Radha — the language of West Bengal...
(2) Varendra — dialect of North Central Bengal...
(3) Kamarupa — dialect of North-East Bengal and Assam; and
(4) Banga — dialect of Eastern and South-Eastern Bengal.

প্রাচীন মাগধী অপভ্রংশ পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ার পর আঞ্চলিক ভেদে চারটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে— রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ ও বঙ্গ।

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষাগুলি মূলত মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তনেরই ফল। পশ্চিমের রাঢ়ি থেকে শুরু করে পূর্বের বঙ্গালী এবং উত্তরের বরেন্দ্রী ও কামরূপী— এই সবকটি উপভাষাতেই প্রাচীন মাগধীর মৌলিক ধ্বনিগত ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি কম-বেশি বজায় রয়েছে।[৬]

মাগধী প্রাকৃত কেবল বাংলা ভাষারই জননী নয়, এটি একটি গোটাভাষা পরিবারের উৎস। মাগধী অপভ্রংশের তিনটি প্রধান শাখা থেকেপূর্বাঞ্চলীয় আধুনিক ভাষাগুলোর বিকাশ ঘটেছে:ওড়িয়া: দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা থেকে উদ্ভূত।বাংলা ও অসমীয়া: উত্তরপূর্ব শাখাথেকে উদ্ভূত (যে কারণে বাংলা ও অসমীয়া ভাষার ধ্বনি ও ব্যাকরণেগভীর সমতা বিদ্যমান)। মৈথিলী ও মগহী: মধ্য শাখা থেকে উদ্ভূত।

> "মাগধী প্রাকৃত প্রাকৃতে অর্বাচীনতম এবং সর্বনিম্ন স্তরের ভাষা। প্রাচীন মগধ দেশে, অর্থাৎ আধুনিক দক্ষিণ বিহারে, এই ভাষার জন্ম ও চলন ছিল। প্রাকৃত অলংকারিকদের মতে পূর্ব ভারতের প্রাকৃতই মাগধী।"[৭]

মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশ এবং তাহা হইতে পূর্ব ভারতের আধুনিক আর্যভাষাগুলির— অর্থাৎ বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী), ওড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া— উৎপত্তি হইয়াছে।

ধ্বনি পরিবর্তনের বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলায় সঞ্চারিত হয়েছে:. ক্ষ কারের উচ্চারণ রূপান্তর: প্রাকৃতে 'ক্ষ' (kṣ) ধ্বনিটি ভেঙে 'ক্ষ' -> 'খ' বা 'ছ' হয়ে যায়। বাংলায় এইসূত্রের প্রভাব প্রচুর।

উদাহরণ: সংস্কৃত {অক্ষি} - প্রাকৃত {অক্খি} - বাংলা {আঁখি}

উদাহরণ: সংস্কৃত {ক্ষেত্র} - প্রাকৃত {খেত্ত} - বাংলা {খেত}.

ব্যঞ্জনসঙ্গতি ও স্বরভক্তি: প্রাকৃতে যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে একক ব্যঞ্জনে রূপান্তরের যে নীতি দেখা যায়, তা বাংলায় অপ্রতিহত থেকে গেছে (যেমন: {ধর্ম} {ধম্ম} {ধরম/ধর্ম})।

বাংলা ভাষার জন্ম ও বিকাশের মূল শিকড়টি প্রোথিত রয়েছে মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে। সহজ কথায় বলতে গেলে, মাগধী প্রাকৃত হলো বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ বা জননী। নিচে বাংলা ভাষার সাথে

মাগধী প্রাকৃতের মেলবন্ধন ও সম্পর্কটি কয়েকটি ধাপে বিশ্লেষণ করা হলো: বাংলা ভাষা সরাসরি সংস্কৃত থেকে আসেনি। ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের পথ ধরে মাগধী প্রাকৃতের মাধ্যমেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চলে (মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ অঞ্চলে) যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তা-ই মাগধী প্রাকৃত। খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকের দিকে এই মাগধী প্রাকৃতেরশেষ রূপ (মাগধী অপভ্রংশ) থেকে প্রাচীন বাংলার (যেমন: চর্যাপদেরভাষা) জন্ম হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩৯)-এ ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও নিয়ম সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ অথচ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন।ধ্বনি পরিবর্তনের মূল কারণ বা নিয়ম প্রসঙ্গে তাঁর বই থেকে সরাসরি প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

> "মানুষের কথা বা উচ্চারিত শব্দ সময়ের সহিত এবং স্থানের পরিবর্তনে বদলাইয়া যায়। উচ্চারণ-যন্ত্রের অলসতা বা অসাবধানতা, অপরকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা, এবং দ্রুত ও অস্পষ্ট উচ্চারণ প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তনের প্রধান কারণ।"[৮]

ধ্বনি-পরিবর্তন মূলত উচ্চারণ-সুবিধার দিকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার ফলেই ঘটে। মুখের আলস্য বা কম চেষ্টায় অধিক কথা বলিবার ইচ্ছা হইতে ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মগুলির উৎপত্তি।

বইটিতে তিনি বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোকে কয়েকটি প্রধান নিয়মে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন-

১. সমীভবন: পাশাপাশি দুটি অসম ধ্বনি উচ্চারণের সুবিধার্থে একে অপরের প্রভাবে সমতা প্রাপ্ত হওয়া।
২. বিষমীভবন: দুটি সমধ্বনি পাশাপাশি থাকলে বৈচিত্র্য আনার জন্য একটির পরিবর্তন।
৩. অভিশ্রুতি: পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন।
৪. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ: যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণের সুবিধার জন্য মধ্যে স্বরধ্বনি আনা (যেমন- রত্ন > রতন)।
৫. অপিনিহিতি: শব্দের মধ্যস্থ 'ই' বা 'উ' ধ্বনি আগেভাগেই উচ্চারিত হওয়া।"

ভাষা একটি জীবন্ত ও গতিশীল সত্তা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং স্থানভেদে ভাষার যে রূপান্তর ঘটে, তার মূলে রয়েছে ধ্বনি পরিবর্তন। ভাষাবিজ্ঞান ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও নিয়মাবলীকে অত্যন্ত সহজ ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।নিচে এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ধ্বনি পরিবর্তন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং মানুষের স্বভাবজাত শারীরিক ও মানসিক প্রবণতারই ফসল। এর প্রধান কারণগুলো হলো:উচ্চারণ-প্রয়াসের লাঘব **(মুখের আলস্য):** মানুষ স্বভাবতই কম পরিশ্রমে বা দ্রুত বার্তা পৌঁছাতে চায়। ফলে জটিল যুক্তব্যঞ্জন বা কঠিন উচ্চারণকে সহজ করে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় (যেমন: রত্ন > রতন, সপ্ত > সাত)। অনুশীলন ও অনুকরণের ত্রুটি**:** এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ভাষা হস্তান্তরিত হওয়ার সময় হুবহু অনুকরণ সম্ভব হয় না, যার ফলে উচ্চারণে সূক্ষ্ম পার্থক্য তৈরি হয়।

ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত প্রভাব**:** ভিন্ন জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের বাগ্যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহারে পার্থক্য আসে, যা স্থানীয় উচ্চারণে পরিবর্তন আনে। ধ্বনি পরিবর্তনের এই কারণগুলো বাংলা ভাষায় মূলত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়।

১. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ**:** উচ্চারণকে কষ্টসাধ্য যুক্তব্যঞ্জন মুক্ত করতে মাঝখানে স্বরধ্বনি আনা হয় (যেমন- ধর্ম > ধরম)।

২. অপিনিহিতি: শব্দের মধ্যে অবস্থিত 'ই' বা 'উ' ধ্বনি নির্দিষ্ট স্থানের আগেই উচ্চারিত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা (যেমন- আজি > আইজ)।

৩. অভিশ্রুতি: অপিনিহিতির পর সেই 'ই' বা 'উ' ধ্বনি যখন চারপাশের স্বরধ্বনিকে বদলে দিয়ে নিজে বিলীন হয় (যেমন- আইজ > আজ)।

৪. সমীভবন: পাশাপাশি থাকা দুটি ভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণের সুবিধার্থে পরস্পরের প্রভাবে এক হয়ে যাওয়া (যেমন: পদ্ম > পদ্দ)। সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, ধ্বনি পরিবর্তন ভাষার কোনো 'ত্রুটি' বা 'অবনতি' নয়; বরং এটি ভাষার স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত বিবর্তনেরই চিহ্ন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, ধ্বনি পরিবর্তন মূলত মানবীয় বাক্‌যন্ত্রের সুবিধাবাদিতা ও অর্থনৈতিকতার প্রত্যক্ষ ফল। আর এই পরিবর্তনের ধারাবাহিক নিয়মগুলো অনুধাবন করাই ভাষাবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।

বাংলা ভাষার নিজস্ব কিছু ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আমরা সরাসরিমাগধী প্রাকৃত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি: 'শ' (ʃ) ধ্বনির প্রাধান্য: মাগধী প্রাকৃতে তিনটি 'স'(শ, ষ, স)এর জায়গায় প্রধানত তালব্য 'শ' উচ্চারিত হতো। আধুনিক বাংলাতেও আমরা 'স' বা 'ষ' লিখলেওউচ্চারণ করি 'শ' (যেমন: 'সংসার' -> 'শংশার', 'সত্য' 'শত্য')। 'ক্ষ' ধ্বনির 'খ' বা 'ছ'-তে রূপান্তর: সংস্কৃতের 'ক্ষ' মাগধী প্রাকৃতে 'খ' বা 'ছ' হয়ে বাংলায় এসেছে

(যেমন- সংস্কৃত {অক্ষি}- প্রাকৃত {অক্খি}- বাংলা -{আঁখি})।

সুকুমার সেন তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ভাষার ইতিবৃত্ত'-এ বাংলা ভাষার নিজস্ব ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। "বাংলা ভাষার নিজস্ব ধ্বনিগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রধান ভিত্তি হলো স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony), অভিশ্রুতি (Umlaut/Assimilation) এবং শ্বাসাঘাতের (Stress Accent) প্রভাব।"[৯]

বাংলা ভাষার প্রধান ৩টি নিজস্ব ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য (সংক্ষেপে):

- স্বরসঙ্গতি : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে।
  (যেমন: desh > deshi > dishi)
- অভিশ্রুতি : অপিনিহিতির ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরবর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে রূপান্তর লাভ করে।
  (যেমন: koriyachhi > koira > korchi)
- শ্বাসাঘাত : বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথমাক্ষরে (First Syllable) জোর বা শ্বাসাঘাত পড়ে, যা বাংলা উচ্চারণের নিজস্ব প্রকৃতি তৈরি করে।

আচার্য সুকুমার সেন তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'ভাষার ইতিবৃত্ত'-এ বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিবর্তন এবং এর ধ্বনিগত পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (সংস্কৃত) থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে কীভাবে বাংলা ভাষা তার নিজস্ব ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, তা তিনি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) ও ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) নিয়ে তাঁর মূল ভাবনার ওপর ভিত্তি করে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. স্বরসঙ্গতি : সুকুমার সেন বাংলা ভাষার একটি অন্যতম প্রধান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বরসঙ্গতিকে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা উচ্চারণে একটি শব্দের ভেতরের এক স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদাহরণ: দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলেতি, তুলা > তুলো।

তাৎপর্য: এটি বাংলা ভাষার উচ্চারণে একটি সহজবোধ্যতা ও স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ নিয়ে আসে, যা সংস্কৃত বা অন্যান্য প্রতিবেশী ভাষায় এই রূপে দেখা যায় না।

২. অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি : বাংলা ভাষার বিবর্তনে ধ্বনি পরিবর্তনের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি।

অপিনিহিতি: শব্দের ভেতরের 'ই' বা 'উ' কার আগেভাগে উচ্চারিত হওয়া (যেমন: আজি > আইজ)।

অভিশ্রুতি: অপিনিহিতির ফলে এগিয়ে আসা স্বরধ্বনি যখন পাশের স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে নতুন রূপ নেয় (যেমন- সং. করিয়া > প্রাকৃ. কঅরিআ > অপিনিহিতি: কইরা > অভিশ্রুতি: করে)।

৩. শ্বাসাঘাত বা প্রারম্ভিক বলঘাত : বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রথমাংশে বা প্রথম অক্ষরে একধরনের স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত বা জোর পড়ে। যেমন- **'রা'**খাল, **'বা'**ংলা, **'মা'**নুশ।

এই শ্বাসাঘাতের কারণেই বাংলা ভাষার ছন্দে (বিশেষ করে লোকছন্দ বা ছড়ার ছন্দে) একটি নিজস্ব দোলা ও গতি তৈরি হয়।

৪. সংবৃত 'অ' এবং ব্যঞ্জনে তালব্যকরণ : সংস্কৃতের রূপ থেকে বের হয়ে এসে বাংলা ভাষার উচ্চারণে 'অ' এবং অন্যান্য ধ্বনিতে বেশ কিছু নিজস্ব পরিবর্তন ঘটেছে:

ক. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ: বাংলায় লেখা হয় 'অ', কিন্তু উচ্চারিত হয় 'ও'-এর মতো (যেমন: অতি > উচ্চারিত হয় ওতি, মন > উচ্চারিত হয় মোন)।

খ. মূর্ধন্য ও দন্ত্য ধ্বনির তালব্যভাব: বাংলায় মূর্ধন্য 'ণ' এবং দন্ত্য 'ন'-এর উচ্চারণে স্পষ্ট পার্থক্য নেই, দুটিই সাধারণত দন্ত্য হিসেবে উচ্চারিত হয়। একইভাবে 'শ, ষ, স'-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় তালব্য 'শ' প্রাধান্য পায়।

৫. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ : প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কঠিন যুক্তবর্ণগুলো বাংলা ভাষায় এসে সহজ ও কোমল রূপ নিয়েছে:

সংস্কৃত: হস্ত > প্রাকৃত: হত্থ > বাংলা: হাত

সংস্কৃত: ভক্ত > প্রাকৃত: ভত্ত > বাংলা: ভাত

সুকুমার সেনের মতে, যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে একক ব্যঞ্জন এবং পূর্ববর্তী স্বরকে দীর্ঘ করার এই প্রবণতা বাংলা ভাষাকে একটি সহজ ও প্রাঞ্জল সুর দান করেছে।সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে বাংলা ভাষা কেবল সংস্কৃতের একটি রূপান্তর নয়; বরং এটি তার ধ্বনিগত গঠন, স্বরধ্বনির সুষম মেলবন্ধন এবং নিজস্ব উচ্চারণের গতিশীলতার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম নিজস্ব ও মিষ্টি একটি ভাষার রূপ লাভ করেছে।

বাংলা ব্যাকরণের মূল কাঠামোটি মাগধী প্রাকৃতের ওপর ভিত্তি করেগড়ে উঠেছে:কারক ও বিভক্তি: বাংলায় ব্যবহৃত প্রথমা ও সপ্তমীবিভক্তি 'এ' (যেমন: 'মানুষে বলে', ঘরে আছে) মাগধী প্রাকৃতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

ক্রিয়াপদের রূপ: বাংলা অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের গঠন (যেমন: 'করল', 'করবে') মাগধী প্রাকৃতের কৃদন্ত রূপথেকেই তৈরি হয়েছে। মাগধী প্রাকৃতে কোনো স্বতন্ত্র বা পূর্ণাঙ্গ কাল্পনিক গল্পগ্রন্থআলাদাভাবে পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন ভারতে রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন বৌদ্ধ জাতক বা পদসূত্র, এবং বিশেষ করে মহাকবি কালীদাসের নাটকে (যেমন: অভিজ্ঞানশকুন্তলম্) সাধারণ ও নিচু শ্রেণীর চরিত্রদের মুখে মাগধী প্রাকৃত ভাষার সংলাপ বা ছোট ছোটঘটনা/গল্পের প্রয়োগ দেখা যায়। নিচে জৈন প্রাকৃত

সাহিত্যের একটি বিখ্যাত শিক্ষণীয় ঘটনাকে প্রাচীন মাগধী প্রাকৃতে উপস্থাপন করা হলো এবং সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো- প্রাকৃত গল্প: 'লুদ্ধকো অণ পক্খী' (ব্যাধ ও পাখি)

"একিহং বোণে এক্কে লুদ্ধকে জালং পালেদি। তহিঁ এক্কে পক্খী বন্দিভোদি।

পক্খী লুদ্ধকং ভণদি— 'ভো লুদ্ধকা, মং মা মারেহি। অহং তুহ কোডিংধণং দেমি'।

লুদ্ধকে ভণদি— 'কহং তুং ধণং দেসি?'

পক্খী ভণদি— 'মোচেহি মং, অহং আগচ্ছামি।'

লুদ্ধকে তং মোচেদি। পক্খী রুক্খং আরুহিঅ হসদি অণ ভণদি— 'অরে মূঢ, হখে আগদং মা দেজ্জাহি!'

লুদ্ধকে পচ্ছাতাপং করেদি।"

"একটি বনে এক ব্যাধ (শিকারি) জাল ফেলল। সেখানে একটি পাখিবন্দি হলো।

পাখিটি ব্যাধকে বলল—'হে ব্যাধ, আমাকে মেরো না। আমি তোমাকে কোটি টাকা দেব।'

ব্যাধ বলল— 'তুমি কীভাবে টাকা দেবে?'

পাখিটি বলল—'আমাকে মুক্ত করো, আমি ফিরে আসছি।'

ব্যাধ তাকে মুক্ত করে দিল। পাখিটি গাছের ডালে উঠে হেসে বলল—'ওরে মূর্খ, হাতে আসা সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে নেই!'

ব্যাধ শেষপর্যন্ত অনুশোচনা করতে লাগল।"

মাগধী প্রাকৃতের কিছু লক্ষণ (যা এই গল্পে লক্ষণীয়):

১. 'স'-এর জায়গায় 'শ' বা 'স'-এর প্রাধান্য: প্রাকৃতিক বিবর্তনেরূপান্তর।

২. 'র'এর জায়গায় 'ল': মাগধী প্রাকৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'র' ধ্বনি 'ল' হয়ে যায় (যেমন: রুক্খ বা লুদ্ধক)।

৩. বিভক্তি: প্রথমা বিভক্তিতে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার (যেমন: লুদ্ধকে, পক্খী)। মাগধী প্রাকৃতকে তার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও রূপান্তর অনুসারে কয়েকটি নামে বা পরিচয়ে ডাকা হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চলে (মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ বা বর্তমান বিহার, বাংলা, ওড়িশা ও আসাম অঞ্চলে) প্রচলিত থাকার কারণে এটিকে 'পূর্বাঞ্চলীয় প্রাকৃত' বা 'প্রাচ্য প্রাকৃত' বলা হয়।

৪. প্রাচীন ভারতীয় নাটকে (যেমন: মহাকবি কালীদাসের নাটক বা 'মৃচ্ছকটিকম্' এ) রাজা বা উচ্চশ্রেণির চরিত্ররা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন, আর জেলে, রাখাল, প্রহরী বা নিচু শ্রেণীর সাধারণচরিত্রদের মুখে 'মাগধী প্রাকৃত' ব্যবহার করা হতো। তাই এটিকে 'জনসাধারণের ভাষা' বা 'লোকভাষা' বলা হতো।

৫. বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্মভাষা (অপভ্রংশের পূর্বরূপ) জৈন ধর্মীয় সাহিত্যের একাংশ (বিশেষ করে অর্ধ-মাগধী) এবং কিছু বৌদ্ধ প্রথাগত সাহিত্যে ব্যবহারের কারণে একে 'ধর্মীয় প্রাকৃত' হিসেবেও চিহ্নিত করাহয়। বিবর্তনের পরের স্তরে গিয়ে মাগধী প্রাকৃত যখন আরও পরিবর্তিতহয়, তখন তাকে 'মাগধী অপভ্রংশ' বা 'মাগধী অবহট্ঠ' বলা হয়।

৬. বাংলা ভাষার জননী- ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার উদ্ভব হয়েছে। তাই ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মাগধী প্রাকৃতকে 'বাংলা ভাষার গর্ভধারিণী' বা 'বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ উৎস' বলা হয়। মাগধী প্রাকৃতের উৎস মূলত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক সংস্কৃত)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তনের নিয়মেই এই প্রাকৃতের জন্ম হয়। উৎস ও বিকাশের মূল ধারাটি

প্রসঙ্গে বলতে গেলে মূল ভাষাবংশ ও ভৌগোলিক উৎসভাষা পরিবার: ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইন্দো আর্য শাখার অন্তর্গত।

ভৌগোলিক অঞ্চল: প্রাচীন ভারতের 'মগধ' মহাজনপদ কে কেন্দ্র করে (বর্তমান বিহারের পাটনা, গয়া, নালন্দা অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী বাংলা, ওড়িশা, আসাম ও পূর্ব উত্তর প্রদেশ) সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা হিসেবে এটি গড়ে উঠেছিল। 'মগধ' অঞ্চলের নামানুসারেই এর নাম হয় মাগধী প্রাকৃত। ভাষার বিবর্তনীয় ধারা (উৎস থেকে রূপান্তর) ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিকাশকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। মাগধী প্রাকৃত এর দ্বিতীয় বা মধ্য যুগে আবির্ভূত হয়।

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ - ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ): বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতে ব্যবহৃত রূপ।

২. মধ্য ভারতীয় আর্য (৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ - ১০০০ খ্রিস্টাব্দ): সংস্কৃত যখন পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন আমজনতার মুখে ব্যাকরণের নিয়ম শিথিল হয়ে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়। পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত এই সাধারণের রূপটিই হলো মাগধী প্রাকৃত।

৩. ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট (মৌর্য ও মগধ সাম্রাজ্য): খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোকের শাসনকালে এবং মৌর্য সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক রূপ ও সাধারণের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হতো।

বুদ্ধ ও মহাবীরের যুগ: গৌতম বুদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবীর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তৎকালীন পূর্বাঞ্চলীয় প্রাকৃত (মাগধী ও অর্ধমাগধী)কে তাঁদের ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। 'মগধ' রাজ্যের নামানুসারেই এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার নাম হয়েছিল 'মাগধী' বা 'মাগধী প্রাকৃত'। মগধ ও মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে এই গভীর সম্পর্কের ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিকগুলো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো: নামকরণের উৎস প্রাচীন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী মহাজনপদ বা রাজ্য ছিল মগধ (যা বর্তমান বিহারের পাটনা, গয়া, নালন্দা অঞ্চল এবং তার আশে পাশের ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল)। মগধ স্থানের অধিবাসী ভাষাকে বোঝাতে ব্যাকরণের নিয়মে 'মগধ' শব্দটির সাথে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তৈরি হয় 'মাগধ' বা 'মাগধী'। অর্থাৎ, মগধের ভাষা = মাগধী প্রাকৃত। মগধ সাম্রাজ্য ও প্রাকৃতের প্রসার মগধের রাজকীয় উত্থানের সাথে সাথে মাগধী প্রাকৃতও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে যে পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার রূপ দেখা যায়, তা মাগধী প্রাকৃতেরই প্রাথমিক রূপ।

জনসাধারণের প্রয়োগ: সংস্কৃত ছিল পণ্ডিত ও রাজসভার উচ্চমার্গের ভাষা, আর মগধের রাজপথ, বাজার ও আমজনতার মুখের জীবন্ত ভাষা ছিল এই মাগধী প্রাকৃত।

বাংলা ভাষার সাথে সেতু: এই মগধের ভাষা মাগধী প্রাকৃতই কালক্রমে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গ, কলিঙ্গ ও কামরূপ অঞ্চলে প্রবেশ করে। সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে এটি মাগধী অপভ্রংশ রূপ নেয় এবং খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকের দিকে মগধের এই প্রাচীন রূপান্তর থেকেই জন্ম নেয় আমাদের বাংলা ভাষা। মগধের লোকভাষা মাগধী প্রাকৃত কীভাবে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হয়ে আজকের বাংলা ভাষাকে জন্ম দিল, তা বাংলা ভাষা তত্ত্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি ইতিহাস। এই রূপান্তর কোনো একদিনে ঘটেনি; এটি ছিল প্রায় দেড় হাজার বছরের এক দীর্ঘ সামাজিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের ফল। এই রূপান্তরের পুরো প্রক্রিয়া ক্রমটি হলো।

ভৌগোলিক বিস্তার: মগধ থেকে বঙ্গাল দেশেআগমন. প্রাচীনকালে মগধ (বর্তমান বিহারের পাটনা, গয়া অঞ্চল) ছিল শিক্ষা, বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র (মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য)। ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক

কাজকর্ম এবং জনবসতি স্থানান্তরের মাধ্যমে মগধের লোকভাষা মাগধী প্রাকৃত ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ছড়াতে থাকে। এটি পূর্ব ভারতের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও কামরূপ (বর্তমান বাংলা, ওড়িশা ও আসাম) অঞ্চলে প্রবেশ করে স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষার সাথে মিশে যেতে শুরু করে। ভাষার তিন স্তরের বিবর্তন ভাষাবিজ্ঞানী ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব মূলত তিনটি বড় ধাপ অতিক্রম করেছে।

ধাপ ১: মাগধী প্রাকৃত (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০খ্রিস্টাব্দ) মগধ ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকভাষা। এই স্তরে ব্যাকরণের জটিল নিয়মগুলো সহজ হতে শুরু করে। মাগধী অপভ্রংশ/অবহট্ঠ (খ্রিস্টাব্দ ৬০০– ৯০০) 'অপভ্রংশ' শব্দের অর্থ 'ভ্রষ্ট' বা পরিবর্তিত রূপ। মাগধী প্রাকৃত যখন সাধারণ মানুষের মুখে আরও বেশি পরিবর্তিত ও সহজ হয়ে গেল, তখন তাকে বলা হলো মাগধী অপভ্রংশ। এই মাগধী অপভ্রংশই বিভিন্ন অঞ্চলে ভেঙে গিয়ে একাধিক শাখার জন্ম দেয়। এর উত্তরপূর্ব শাখা থেকেই জন্ম নেয় বাংলা ও অসমীয়া ভাষার রূপ। প্রাচীন বাংলা (খ্রিস্টাব্দ ৯০০/১০০০– ১৩৫০) মাগধী অপভ্রংশের গর্ভ থেকেই খ্রিস্টীয় ১০ম শতকের দিকে জন্ম নেয় প্রথম আদি বা প্রাচীন বাংলা। এই ভাষার প্রথম লিখিত রূপ আমরা পাই চর্যাপদে। মানুষ স্বভাবতই উচ্চারণ সহজ করতে পছন্দ করে। মাগধী প্রাকৃতের জটিল ও যুক্ত ব্যঞ্জনযুক্ত শব্দগুলো অপভ্রংশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মুখে ক্ষয়ে গিয়ে আধুনিক বাংলা শব্দে পরিণত হয়। সংস্কৃত (প্রাচীন আর্য): হস্তমাগধী প্রাকৃত (মধ্য স্তর): হত্থ (যুক্তবর্ণের প্রাধান্য) বাংলা (আদি স্তর): হাত (একক ব্যঞ্জন ও দীর্ঘ স্বরধ্বনি) মাগধী অপভ্রংশ রূপটি যখন পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে অঞ্চল ভেদে তা আলাদা রূপ নিতে থাকে। ফলে একই মাগধী মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় একাধিক 'বোন' ভাষা: পূর্বশাখা: বাংলা ও অসমীয়া (তাই এই দুই ভাষার মধ্যে সর্বাধিক মিল পাওয়া যায়)। দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা: ওড়িয়া। পশ্চিম শাখা: মৈথিলী ও মগহী। মগধের প্রাকৃত ভাষা যখন বঙ্গ অঞ্চলে এসে সাধারণ মানুষের জীবন্ত মুখের উপভাষায় পরিণত হলো এবং সময়ানুক্রমে ব্যাকরণের জটিলতা হারিয়ে সহজ-সরল রূপ নিল, তখনই সৃষ্টি হলো আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার। *ভাষার ইতিবৃত্ত,* (পুনর্মুদ্রণ/আনন্দ সংস্করণ)। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭১–৭৪।

২. চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ৫২–৫৫।

৩. শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ। *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৫–৩৮।

৪. শ', ড. রামেশ্বর। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৬০–১৬৪।

৫. সেন, সুকুমার। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৯ পৃ. ৮৫–৮৯।

৬. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (ODBL)*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কলকাতা, ১৯২৬, পৃ. ৯১–৯৩।

৭. চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। তদেব, পৃ. ৮০–৮৩।

৮. চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। তদেব, পৃ. ৫৮–৬০।

৯. সেন, সুকুমার। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ৯২–৯৫।